৮.৪.১ রামমোহন রায়

রামমোহন রায় একটি সম্মানিত ও ধর্মীয় ঐতিহ্যসম্পন্ন রাঢ়ী কুলিন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নবাবি আভিজাত্যের দিনগুলির অবসানের ফলে তাঁর পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু কোম্পানি সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে এই পরিবার পুনরায় সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। কর্নওয়ালিসের ভূমিরাজস্ব নীতির ফলে সম্পত্তি হিসাবে জমির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৯৩ সালের ৬ মার্চ কর্নওয়ালিস কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—দেশীয় অভিজাতদের হাতে যে

Scanned by CamScanner

প্রচুর পরিমাণ পুঁজি সঞ্চিত আছে, সেই পুঁজি জমি কেনার জন্য বিনিয়োগ করানো যাবে, যদি জমির মালিকানা সংক্রান্ত নিরাপত্তা বাড়ানো যেতে পারে। অন্যান্য শহুরে পয়সাওলা লোকেদের মতোই রামমোহন কর্নওয়ালিসের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে ১৭৯৯ সালে ৭নং রেগুলেশনের পর প্রচুর জমি ক্রয় করেছিলেন। জমিদারি থেকে আয় করা ছাড়াও তিনি সুদের বিনিময়ে কোম্পানির কর্মচারীদেরও ঋণ দিতেন। সুতরাং ইংরেজ শাসনের প্রতি রামমোহনের প্রশংসামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থাকার পেছনে যথেষ্ট বাস্তব কারণ ছিল।

রামমোহন রায় মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন ইংরেজ শাসন ভারতীয়দের অজ্ঞতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেবে, তাদের সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে এবং তার ফলে ভারতে কানাডার মতো একটি মিশ্র জাতির সৃষ্টি হবে। এরা কোনোদিনই ইংল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে আগ্রহ প্রকাশ করবে না। স্যার জন ম্যালকম লিখেছিলেন—ভারতবর্ষকে সভ্য করার সবথেকে সহজ উপায় ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, কারণ ভারতবর্ষ ব্রিটেনের উপনিবেশ হলে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হবে এবং জমির দাম বাড়বে। রামমোহন রায়ও অনেকটা একই রকম চিন্তাভাবনা করতেন। তিনি বলতেন গ্রামের মানুষ ঔপনিবেশিক শাসন মেনে নিতে দ্বিধা করবেন না কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে গ্রামাঞ্চলে মেহনতি মানুষের মজুরি বৃদ্ধি পাবে। তিনি নীলকর সাহেবদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। ন্যাথানিয়েল আলেকজান্ডারকে লেখা চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন—নীল আবাদকারী ইউরোপীয় সাহেবরা নীলচাষিদের অধিক টাকা অগ্রিম ও আফিম কেনার জন্য যথেষ্ট ভালো দাম দেয়। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে নীলের আবাদ বাংলার চাষিদের চরম দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একাধিক কৃষক অভ্যুত্থান হয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত ইংরেজরা বাংলাদেশে নীলচাষ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে রামমোহন রায় ও তাঁর সঙ্গীরা ইংরেজ শাসনের জয়গান গেয়েছিলেন। ভি. জ্যাকেমোঁ (V. Jacquemont)-কে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছিলেন—ভারতবর্ষের আরও দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজ আধিপত্য মেনে নেওয়া দরকার, কারণ সে ইংরেজ শাসনাধীনে তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনর্ঘোষিত করছে (India requires many more years of English domination so that...she is reclaiming her political independence.)।

উনিশ শতকীয় জাগরণে রামমোহন শাসকদের সহযোগিতায় সবথেকে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন ধর্মের ক্ষেত্রে। ১৮২৮ সালে তিনি তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন—"আমি মনে করি ভারতীয়দের রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিধার জন্য তাদের ধর্মীয়

Scanned by CamScanner

ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আসা উচিত' (It is, I think, necessary that some changes should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort.)। ধর্ম সম্পর্কে রামমোহনের এই ধারণা এসেছিল, যখন তিনি পরিণত বয়স্ক। প্রথম জীবনে তিনি তাঁর ধর্মীয় আবেগের তাগিদে ফার্সি ভাষায় তুহফুৎ-ই-*মুয়াহিদ্দিন* রচনা করেন। এই গ্রন্থ খুব সম্ভবত ১৮০৪ সালে রচিত হয়েছিল। এখানে তিনি জোরের সঙ্গে এক সর্বশক্তিমানের অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন, যার দ্বারা গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে ও পরিচালিত হচ্ছে। ঐ লেখায় তিনি মুজ্‌তাহিদ বা ধর্মীয় দালালদের (যারা নিজেদের ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র বলে দাবি করে) যুক্তি-বিবর্জিত কার্যকলাপ এবং কুসংস্কারের তিক্ত সমালোচনা করেছিলেন। রামমোহনের মতে, এরা জনসাধারণের বৌদ্ধিক ও যুক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তুহফুৎ-এ যে যুক্তি তিনি তুলে ধরেছিলেন তার স্বরূপ ছিল এইরকম—কেবলমাত্র একজন সর্বশক্তিমানের অস্তিত্ব রয়েছে; পারলৌকিক বিশ্বাস ও আত্মার অস্তিত্ব এবং ধর্মীয় দালালদের বা পুরোহিত শ্রেণীর নেতিবাচক তথা প্রতারণামূলক ভূমিকা। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুমিত সরকার দেখিয়েছেন—তুহফুতে রামমোহন যে যুক্তির অবতারণা করেছিলেন, তার থেকে পরবর্তীকালে তিনি অনেকটাই সরে এসেছিলেন। রামমোহনের অধ্যাত্মবাদের শিকড় অনেকটাই শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদের মধ্যে গ্রথিত ছিল। তাঁর নির্গুণ ব্রাহ্মণ ও জীবের মধ্যে ঐক্য, মোক্ষের প্রকৃতি ও স্বরূপ এবং কর্মকাণ্ডের আপেক্ষিক অপ্রাসঙ্গিকতা প্রভৃতি সংক্রান্ত ধারণাগুলি শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ থেকে এসেছিল। কিন্তু অন্তত দুটি ক্ষেত্রে শংকরের অদ্বৈতবাদের সাথে তাঁর মতানৈক্য ছিল। প্রথমত, শংকরের কাছে পুজো করার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল জ্ঞানলাভ করা। প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই মানুষ অজ্ঞাত ও দ্বৈধতাকে দূরে সরিয়ে রেখে মোক্ষলাভ করতে পারে। কিন্তু রামমোহন রায় জ্ঞানলাভের থেকে পূজা-পার্বণকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় উপদেশ ও ধর্মীয় গাথা থেকে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য পাঠ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন দ্বিতীয়ত, শংকরের সন্ন্যাস-সংক্রান্ত ধারণাও রামমোহন তাঁর উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্জনীয় বলে মনে করেছিলেন। রামমোহন রায় ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৯ সালের মধ্যে বেদান্ত দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পাঁচটি প্রধান উপনিষদ অর্থাৎ কেন, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক এবং মাণ্ডুক্য উপনিষদের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন এবং ব্রহ্মসূত্রের একটি টীকা রচনা করেছিলেন। স্যানফোর্ড আর্নট লিখেছেন—"সামাজিক কল্যাণের থেকে ধর্মীয় ব্যাপারেই রামমোহনের উৎসাহ ছিল বেশি এবং তিনি নাস্তিকতার কুফল সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। তৎকালীন কলকাতায় পূর্ব ভারতীয়দের নিয়ে বিশেষত

Scanned by CamScanner

কয়েকজন হিন্দু যুবককে নিয়ে একটি দল গড়ে উঠেছিল (নব্যবঙ্গের কথা বলা হয়েছে)। যাঁরা নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি এই দলকে তিক্ত ভাষায় নিন্দা করতেন এবং মনে করতেন এরা ধর্মান্ধ হিন্দুদের থেকেও ক্ষতিকারক'' (He became more strongly impressed with the importance of religion to the welfare of the society, and the pernicious effect of skepticism...He often deplored the existence of a party which had sprung up in Calcutta partly composed of East Indians, partly of the Hindu youth, who from education had learnt to reject their own faith...This he thought more debared than the most bigotted Hindu.)। কিশোরীচাঁদ মিত্রও রামমোহনের উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করে বলেছেন তিনি ছিলেন একজন ধর্মীয় বেন্থামাইট এবং তিনি কোনো মতের সত্যতা বা অসত্যতার দিকের চেয়ে উপযোগের দিকটিকেই অধিক গুরুত্ব সহকারে দেখতেন। তিনি নিজে পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু পৌত্তলিকতাকে পুরোপুরি বর্জন করতে বলেননি। তিনি বলতেন, যাদের মানসিকতা যথেষ্ট পরিণত নয়, তারা মূর্তিপূজা করতে পারে। তাঁর ধর্মীয় উপযোগিতাবাদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন আমরা দেখি যে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেদান্ত দর্শনের কিছু মতও গ্রহণ করেননি। বেদান্ত দর্শন যাবতীয় পার্থিব বিষয় এমনকি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের বর্জনের কথা বলেছে। কিন্তু রামমোহন বেদান্তের এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেননি। খ্রিস্টান নীতিবোধের প্রতি তাঁর অনুরাগ এসেছিল সামন্ততান্ত্রিক নৈতিকতার প্রতি আনুগত্য এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে সখ্যতা থেকে।

রামমোহন তাঁর সামাজিক ও ধর্মীয় ধারণার প্রতিফলন ঘটানোর উদ্দেশ্যে ১৮১৫ সালে অভিজাত শ্রেণীর একাংশকে নিয়ে আত্মীয় সভা গঠন করেন। কিন্তু আত্মীয় সভার কার্যাবলি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। মানুষের মধ্যে দ্রুত ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য তিনি ১৮২৮ সালের আগস্ট মাসে ব্রাহ্মসভা গঠন করেন। ১৮৩০ সালে জানুয়ারি মাসে এই সংগঠনের নাম হয ব্রাহ্মসমাজ। তুহফুৎ-এ এবং সংক্ষিপ্তাকারে বেদান্ত অনুবাদ করতে গিয়ে রামমোহন রায় পুরোহিততন্ত্রকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন—বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মণই মূর্তিপূজার অর্থহীনতা সম্পর্কে সচেতন। তাঁরা নিজেদের স্বার্থেই এসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথা ও ক্রিয়াকলাপ টিকিয়ে রেখেছেন। তিনি ব্রাহ্মণদের কুসংস্কার এবং ব্রাহ্মণদের নিজেদের জাগতিক সুবিধার জন্য এইসব কুপ্রথাকে তারা যে মদত দেয় এইসব ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে তাঁর কাজের বড়ো রকম বিচ্যুতি চোখে পড়ে। ব্রাহ্মসমাজের উদ্বোধনের দিনটিতে ব্রাহ্মণদের অর্থ উপহার

Scanned by CamScanner

হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। হেমচন্দ্র সরকারের লেখা থেকে জানা যায়—এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের বিশেষ মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছিল। একটি আলাদা ঘরে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরাই বসেছিলেন এবং একমাত্র তাদেরই বেদ পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ছিল মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার ও কুপ্রথার হাত থেকে অশিক্ষিত সাধারণকে মুক্ত করা। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্রাহ্মসমাজ দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজ কতিপয় শিক্ষিত মানুষের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মতো কিছু সদস্যের কার্যকলাপে যথেষ্ট অসঙ্গতি ধরা পড়েছিল কারণ তাঁরা সমাজে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কথা বলতেন, কিন্তু বাড়িতে মূর্তিপূজা চালিয়ে গিয়েছিলেন। রামমোহন সমাজের সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারেননি। তাছাড়া কতকগুলি বিষয়ে তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিল বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি নিজে একেশ্বরবাদী ছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন বাংলার গ্রামীণ সমাজে বলরামী, রামবল্লভী, সাহেবধনী প্রভৃতি কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী (sect) ছিল যারা একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে ধর্মাচরণ করত। রামমোহন কখনোই এই একেশ্বরবাদী গোষ্ঠীগুলিকে ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত করার প্রয়াস নেননি।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও রামমোহন রায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। হিন্দু সমাজে প্রচলিত সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন রায় সোচ্চার হয়েছিলেন। স্ক্র্যাফটন লিখেছেন—সতীদাহ প্রথার প্রচলন কেবলমাত্র উচ্চবর্ণ ও উচ্চবর্গের পরিবারগুলির মধ্যেই সীমিত ছিল। অষ্টাদশ শতকের অন্তিমলগ্নে জে. এস. স্টাভরিনাস (J. S. Stavorinus) লিখেছিলেন—কয়েকটি বর্ণের মধ্যেই সতীদাহের প্রচলন ছিল। এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারিরা। উইলিয়াম কেরি গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লিকে এই কুপ্রথা বন্ধ করার জন্য আবেদন করেছিলেন। এই প্রথার বিরুদ্ধে সরকারি হস্তক্ষেপ ক্রমে শুরু হয়েছিল। ১৮১২, ১৮১৩ ও ১৮১৭ সালের রেগুলেশন মারফত সরকারি হস্তক্ষেপ এবং মিশনারিদের কার্যকলাপের ফলে ১৮১৮ সাল থেকে সতীদাহের ঘটনা বেশ কমতে শুরু করেছিল। একথা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে রামমোহন ঐ বছরই প্রথম সতীদাহ প্রথাকে আক্রমণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রামমোহনের আগেই ১৮১৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সতীদাহ প্রথাকে আক্রমণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই সময় সরকারি হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন বছরে সতীদাহের ঘটনার সংখ্যা ছিল এরকম ঃ ১৮১৮—৮৩৯, ১৮১৯—৬৫০, ১৮২০—৫৯৮ এবং ক্রমে এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ১৮২৮ সালে হয়

Scanned by CamScanner

৪৬৩। রামমোহন রায় তাঁর সম্পাদিত *সংবাদ কৌমুদি* পত্রিকায় বারবার সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার বক্তব্য রেখেছিলেন। এর ফলশ্রুতি হিসাবে গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৭নং রেগুলেশন জারি করে সতীদাহ প্রথাকে বেআইনি এবং ফৌজদারি আদালতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেন। বেন্টিঙ্ক কর্তৃক সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের পরই স্যার জন শোর বলেছিলেন—এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত এতটাই সরব যে, যে-কোনো গভর্নর জেনারেলই একই পদক্ষেপ নিতেন। বেন্টিঙ্ক নিজেও স্বীকার করেছিলেন যে জনমতকে অগ্রাধিকার দেবার উদ্দেশ্যেই তিনি এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। বেন্টিঙ্কের নিজস্ব চিঠিতেই আছে যে ১৮২৪-১৮২৮ সালের মধ্যে যশোরের এক ম্যাজিস্ট্রেট সতীদাহ বন্ধের ব্যাপারে কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জনসাধারণ কোনো প্রতিবাদ করেননি। রামমোহনের আশঙ্কা ছিল যে এই প্রথার বিরুদ্ধে আইনি হস্তক্ষেপ করলে জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে এবং তার ফল হবে মারাত্মক। কিন্তু উপরোক্ত তথ্যসমূহ প্রমাণ করে যে রামমোহনের এই আশঙ্কা ছিল ভিত্তিহীন ও অমূলক। ঐতিহাসিক সালাউদ্দিন আহ্‌মেদ দেখিয়েছেন যে রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করার সময় কিন্তু মানুষের যুক্তি ও বিবেকবোধের কাছে আবেদন না করে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের আশ্রয় নিয়েছিলেন। বস্তুত এখান থেকেই উনিশ শতকীয় জাগরণের একটি ধারা তৈরি হয়েছিল—কোনো বিশেষ সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে প্রায় সকলেই শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার উপস্থাপনা করতেন। এই শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার প্রতি আনুগত্য থেকেই রামমোহন রায় তাঁর *পাঠ্য প্রদান*-এ বৈধব্যের কৃচ্ছ্রতাসাধনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর কিন্তু বিধবা-বিবাহকে সমর্থন করেছিলেন।

বাংলার 'নবজাগরণের' পথিকৃৎ রামমোহন রায় কিন্তু তর্কশাস্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে যুক্তি (reason)-কে গ্রহণ করেননি। তিনি *কেনোপনিষদ*-এর মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে স্পষ্টই বলেছিলেন যুক্তির সাহায্যে সর্বদাই সত্যকে জানা যায় না। যুক্তি অনেক সময়েই এক সার্বিক সন্দেহের জন্ম দেয়। খ্রিস্টান মিশনারিরা যখন জাতিভেদ প্রথাকে আক্রমণ করেছিলেন তখন রামমোহন জাতপাত ব্যবস্থাকে তাত্ত্বিক এবং বাস্তব প্রয়োগের দিক থেকে সমর্থন করেছিলেন। ১৮২০ সালে রচিত *ব্রহ্ম-পৌত্তলিক সংবাদ*-এ তিনি সনাতন হিন্দু দর্শনের কর্মের তত্ত্বকে ভিত্তি করে জাতপাত ব্যবস্থা এবং তার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রথার সপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। ১৮২৭ সালের ২৪ জুন রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ্যাডাম লিখেছিলেন—বর্তমান হিন্দু সমাজে প্রচলিত খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলা তিনি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন (All the

Scanned by CamScanner

rules in the present state of Hindu society he finds it necessary to observe, relating to eating and drinking.)।

পরবর্তী প্রজন্মের বহু শিক্ষিত মানুষই রামমোহন রায়ের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার চরম বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টকে পাঠানো একটি চিঠিতে রামমোহন লিখেছিলেন—হিন্দু পণ্ডিতদের দিয়ে শিক্ষাদানের জন্য যে সংস্কৃত স্কুল গড়ে তোলার সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার ফলে ছাত্ররা কেবল ব্যাকরণ ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবে কিন্তু বাস্তব জীবনে এই জ্ঞান সম্পূর্ণ মূল্যহীন। তিনি বেদান্ত, মীমাংসা ও ন্যায়শাস্ত্রকে ছাত্রদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এবং পরিবর্তে অঙ্ক, দর্শন, রসায়ন, অস্থিবিদ্যা প্রভৃতি পড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু এখানেও তাঁর চিন্তাধারা ও কাজের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা যায়। তিনি নিজে কিন্তু ১৮২৬ সালে একটি বেদান্ত কলেজ তৈরি করেন। এই কলেজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার শিক্ষিত মানুষকে কুসংস্কার ও মূর্তিপূজা সংক্রান্ত অন্ধকার থেকে মুক্ত করে প্রকৃত ঐশ্বরিক চিন্তার আলোয় নিয়ে আসা। স্কটিশ মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ যখন খ্রিস্টানধর্ম-নির্ভর শিক্ষাবিস্তারের জন্য ১৮২৯ সালে কলকাতায় আসেন, তখন তিনি রামমোহনের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন। ডিরোজিওর শিক্ষাদান পদ্ধতি তথা নব্যবঙ্গদের সনাতন হিন্দুধর্ম-বিরোধী আচরণ রামমোহনকে ক্রুদ্ধ করেছিল এবং এদের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র আক্রমণ চালিয়েছিলেন। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে শাসকদের কাছে ছাত্রদের বিজ্ঞান পড়ানোর দাবি তুলে তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রেখেছিলেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার যথাযথ প্রয়োগ তিনি করেননি এবং ঐতিহ্যগত নৈতিক শিক্ষার কাঠমোর বাইরে তিনি যেতে পারেননি। হয়তো সে যুগের বিচারে তা সম্ভবও ছিল না। সাধারণ মানুষকে মুক্তির আলোকে আলোকিত করার চেয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতেই তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন।

রামমোহন রায়ের কার্যকলাপের আর এক উল্লেখযোগ্য দিক ছিল এই যে তিনি পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্নে নারীর আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে মেয়েদের বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বা নারীশিক্ষা বিষয়ে তিনি কোনো গঠনমূলক ও পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি রাখেননি। প্রখ্যাত পণ্ডিত সুশীল কুমার দে মন্তব্য করেছেন—রামমোহন কোনোদিনই বহুবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা এবং বিবাহের সময় মেয়ে বিক্রি করা প্রভৃতি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সোচ্চার হননি।

Scanned by CamScanner

সুশীল কুমার দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *History of Bengali Literature in 19th Century*-তে স্পষ্টই বলেছেন—রামমোহনকে যে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনক হিসাবে দেখানো হয়ে থাকে তা একটি অতিকথা বা Myth ছাড়া কিছুই নয়। তাঁর মতে বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রয়েছে। উইলিয়াম কেরি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং তারিণীচরণ মিত্রের হাতে যে ধারার ও ঐতিহ্যের সূত্রপাত, সেই ধারাকেই পরবর্তীকালে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই ধারাবাহিকতা ও ক্রমবিবর্তনে রামমোহন রায়ের স্থান নেই বলে অধ্যাপক দে মন্তব্য করেছেন। অধ্যাপক দে'র সুচিন্তিত মতামত—"রামমোহনের গদ্য কখনোই বাংলা গদ্যের বিকাশে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি বা নির্দিষ্ট স্থান করে নিতে পারেনি। সুতরাং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে তাঁর কোনো রচনাই বাংলা সাহিত্যে ধ্রুপদী হিসাবে স্বীকৃত হয়নি" (Rammohan's prose never influenced nor had it any definite place in this regular course of development. It is no wonder, therefore, that none of his works ever became a classic in Bengali literature.)। প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের বাংলা ভাষা ছিল অত্যন্ত কঠিন, পুঁথিগত এবং সাহিত্যশৈলী বিবর্জিত। পরবর্তী প্রজন্মের গদ্যকারেরা, এমনকি অক্ষয়কুমার দত্ত ও কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি যাঁরা কঠিন গদ্য লিখতেন, তাঁরা পর্যন্ত দার্শনিক প্রবন্ধ লেখার সময় রামমোহনের রচনাশৈলী অনুসরণ করেননি।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে রামমোহন উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। *সংবাদ কৌমুদি* প্রকাশের মাধ্যমে তিনি সমসাময়িক ভারতীয়দের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিলেন। ১৮২৩ সালে কোম্পানি সরকার প্রেস অর্ডিন্যান্স (press ordinance) জারি করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে প্রয়াসী হয়েছিল। রামমোহন রায় ইংরেজ সরকারের এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন। স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার এবং বাক্‌স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে রামমোহনের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু 'প্রেস অর্ডিন্যান্স'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে রামমোহন সরকারের প্রতি যে আবেদনপত্র লিখেছিলেন সেই আবেদনপত্রে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে তিনি যত না সোচ্চার হয়েছিলেন, তার থেকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন শাসিতের বাক্‌স্বাধীনতা মেনে নিলে শাসকের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কী কী সুবিধা হবে, সে বিষয়ে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে সরব হবার সময়ও তিনি ইংরেজ সরকারের প্রশংসা করতে ভোলেননি। অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাস রামমোহনকে 'বিশ্বপথিক' বলে অভিহিত করেছেন। একথা সত্যি যে

Scanned by CamScanner

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলায় রামমোহন ছিলেন অত্যন্ত শিক্ষিত একজন মানুষ। বিভিন্ন ভাষায় এবং প্রাচীন হিন্দু দর্শনে তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তাছাড়া পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও তাঁর সমসাময়িক ইউরোপের ঘটনাবলি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ১৮২১ সালে ইতালির নেপল্‌সে যে রাজতন্ত্র-বিরোধী বিদ্রোহ হয়েছিল তার পরাজয় রামমোহনকে ব্যথিত করেছিল। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের সাফল্য তাঁকে পুলকিত করেছিল। তদানীন্তন ইউরোপে স্বৈরতন্ত্র বনাম উদারপন্থার সংঘাতে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল উদারপন্থার দিকে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় ভারতবর্ষে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তিনি কোনো কথা বলেননি। বরং ঐ শাসনের প্রতি তিনি ছিলেন অসম্ভব মোহগ্রস্ত। রামমোহন যখন ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে তিনি *রিফর্মার* (Reformer) পত্রিকায় তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠির মূলকথা ছিল—ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয়দের আত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং বৈষয়িক উন্নতি ঘটেছে। সুতরাং ইংরেজ সরকারের প্রতি ভারতীয়দের আনুগত্য থাকা উচিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন রায়কে 'ভারত পথিক' হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুশতবর্ষে ১৯৩৩ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধে লিখেছিলেন—রামমোহন ছিলেন ভারতের 'আধুনিক যুগ'-এর পথিকৃৎ (Rammohan Roy inaugurated the Modern Age in India)। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন—রামমোহন তাঁর সময়ে বিশ্বের সমস্ত মানুষের মধ্যে ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সম্পূর্ণভাবে আধুনিক যুগের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন (Rammohan was the only person in his time, in the whole world of man to realise completely the significance of the Modern Age.)। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উল্লিখিত 'আধুনিক যুগ' কথাটির দুটি দিক রয়েছে। একদিকে রয়েছে শিল্পায়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি এবং ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিনির্ভর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যদিকে রয়েছে সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সামাজিক দর্শন ও ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রনৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যেই সীমিত সামাজিক সংস্কার এবং ধর্মনির্ভর যুক্তিবাদের প্রসার। উনিশ শতকের ভারত ইতিহাসে প্রথম দিকটি উন্মোচিত হয়নি। রামমোহন রায় ছিলেন দ্বিতীয় ধারাটির একজন অগ্রগণ্য প্রতিনিধি।

Scanned by CamScanner